ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 768-778
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.288

বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটকে নারী চরিত্রে প্রান্তিকতার উপস্থাপন

ড. আইরিন পারভিন, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The representation of female characters in Bangladeshi drama is often closely associated with marginality. This paper analyzes the position of women in Bangladeshi dramatic literature, their marginalization within socio-political contexts, and the perspectives of playwrights. Historically, from the colonial period to the post-independence era, women have been portrayed as victims of a patriarchal society, a condition reflected through war, poverty, gender discrimination, and cultural conflict. Through illustrative analyses of plays by Syed Shamsul Haq, Selim Al Deen, and others, the study demonstrates that female marginality is not merely a symbol of subjugation but also of resistance. These representations mirror gender-based inequalities in society and stimulate movements for women's emancipation. The discussion explores women's marginality from both literary and sociological perspectives, making it significant for cultural studies in Bangladesh.

Keywords: Women's Representation, Marginality, Bangladeshi Drama, Patriarchy, Feminism, Selim Al Deen, Syed Shamsul Haq, Gender Inequality, Resistance, Cultural Conflict

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর উপস্থাপন একটি জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, নাটকে নারী চরিত্রগুলি সমাজের লিঙ্গভিত্তিক গতিশীলতা, অর্থনৈতিক অসমতা এবং সাংস্কৃতিক চাপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। প্রান্তিকতা (marginality) এখানে একটি কেন্দ্রীয় থিম, যা নারীকে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেয় এবং তাদের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরে। এই আলোচনাপত্রে আমরা বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতার উপস্থাপনকে বিশ্লেষণ করব, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্য, যুদ্ধের প্রভাব এবং নারীমুক্তির আন্দোলনের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাস উপনিবেশকালীন যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নারীকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে দেখা যায়, যেখানে তারা ঐতিহ্যবাহী ভূমিকায় থেকেও প্রতিরোধ দেখায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর, নাট্যকাররা নারীর প্রান্তিকতাকে যুদ্ধের আঘাত, ধর্ষণ এবং সামাজিক অবহেলার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। এই উপস্থাপনা কেবল নারীর দুর্দশা দেখায় না, বরং তাদের শক্তি এবং প্রতিরোধকেও তুলে ধরে।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু নাটকে নারীর প্রান্তিকতার বিভিন্ন মাত্রা অনুসন্ধান করা। এখানে সাহিত্য পর্যালোচনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নির্দিষ্ট নাটকের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিষয়কে গভীরভাবে আলোচনা করব। এটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের লিঙ্গভিত্তিক অসমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং ভবিষ্যতের নাট্যসাহিত্যের জন্য দিকনির্দেশনা দেবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর উপস্থাপন এবং প্রান্তিকতার বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণা এবং সমালোচনামূলক কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় আমরা বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে সমসাময়িক নাটক পর্যন্ত নারী চরিত্রের বিবর্তন, তাদের প্রান্তিক অবস্থান এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবগুলোকে বিশ্লেষণ করব। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীকে প্রায়শই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শিকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা উপনিবেশকালীন যুগ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপস্থাপনা কেবল নারীর দুর্দশা দেখায় না, বরং তাদের প্রতিরোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্পও তুলে ধরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, নারী চরিত্রগুলো প্রধানত ঐতিহ্যবাহী ভূমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নারীকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তারা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে প্রান্তিক অবস্থানে থাকে। এই যুগে নাটকে নারীকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রান্তিকতার শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মতো কাজে প্রতিফলিত। 'শত বছরের বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারী চরিত্রের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে, যা নারীর চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে জড়িত। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃত্বকে একধরনের প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীর লড়াইকে তুলে ধরে। নারীকে পরিবারিক বন্ধন এবং মাতৃত্বের মাধ্যমে প্রান্তিকতা থেকে মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে, যা সামাজিক অসমতার একটি সমালোচনা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর প্রান্তিকতা আরও জটিল রূপ নেয়, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্রের পারিবারিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর নাটকে নারীকে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটক দেশজ সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত, যেখানে নারী যুদ্ধের শিকার এবং সামাজিক অবহেলার প্রতীক। তাঁর নাটকে নারীর মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা বিশ্লেষিত হয়েছে, যা প্রান্তিকতার মাত্রা। যেমন পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, পুরুষের অধীনতা এবং সামাজিক বঞ্চনা তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নাটকে নারীকে নিম্নবিত্তের প্রান্তিক জীবনের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে তারা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকেও প্রতিরোধ সত্তাকে তুলে ধরে।

সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে নারীর উপস্থাপন আরও ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক মাত্রা নেয়। তাঁর 'নারীগণ' নাটকে নবাব মহলে বন্দি নারীদের উপলব্ধি এবং জীবন-বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রান্তিকতার একটি ঐতিহাসিক চিত্র। এই নাটকে নারীকে অধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতিরোধও উঠে আসে নাটকের বিষয়ে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যার পর অন্তঃপুরে বন্দি নারীদের জীবন চিত্রিত হয়েছে, যা উপনিবেশের প্রকৃতি এবং যুদ্ধের পরিণতিকে তুলে ধরে। এখানে নারীকে লুণ্ঠিত এবং ধর্ষিত

হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা প্রান্তিকতার একটি গভীর মাত্রা। সৈয়দ শামসুল হকের নাটক উপনিবেশকালীন যুগের নারীদের মর্যাদা, ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে অনুসন্ধান করে।

আধুনিক বাংলাদেশের নাটক এবং মিডিয়ায় নারীর উপস্থাপন নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, টেলিভিশন নাটকে নারী চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে। 'বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটকে নারীর পরিবেশনা' নামক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাটকে নারীকে বাস্তবজীবনের সাথে সংযুক্ত করে উপস্থাপন করা উচিত। এখানে নারী চরিত্র নির্মাণে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব লক্ষণীয়, যা নারীকে গৃহবধূ, যৌনকর্মী বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রী হিসেবে দেখায়। আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা' নাটকে যৌন-রাজনীতি এবং নিম্নবর্গীয় নারীর চিত্রায়ন দেখানো হয়েছে, যা নারীর প্রান্তিকতাকে পিতৃতান্ত্রিক অত্যাচারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। এই নাটকে নারীকে পুরুষের অধীনতার শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত কোকিলার উক্তিতে-

> "...তদ্দিনে আমার বোঝা সারা, এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষ গো লিগা। এইহানে মাইয়া মানুষের বাঁচনের পথ নাই। এই দুনিয়া পুরুষের বাচ্চার ফুর্তির জায়গা। দেশেও হেগো ফুর্তি। বিদেশেও। তাই ঠিক করলাম, বাঁচুম না। এই দুনিয়ায় বাঁইচ্যা থাকলে আমার জিন্দিগিতে আরও পুরুষ আসব। আমারে বেশ্যা বানাইয়া ছাইরা দিব। তারথন ভাল মইরা খোদার কাছে গিয়া বিচার চাই।"[১]

প্রান্তিকতার থিম নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের সাহিত্যে নারীকে প্রবাসীত্ব, যুদ্ধ এবং সামাজিক অসমতার মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে। মনিকা আলীর 'ব্রিক লেন' এবং তাহমিমা আনামের উপন্যাসে প্রবাসী নারীর প্রান্তিকতা দেখানো হয়েছে, যা নাট্যসাহিত্যেও অনুরূপ। এখানে নারীকে 'অদরিং' এবং পরিচয় গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক করা হয়েছে, যেখানে মাইগ্রেশনের প্রভাবও নারীর জীবনকে পরিবর্তন করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকতা নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় যে, তারা প্রতীকী উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ, যা নাটকে প্রতিফলিত। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এবং টিভিতে নারীর উপস্থাপন নিয়ে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীকে স্টিরিওটাইপিক্যালভাবে দেখানো হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিফলন। এই আলোচনায় তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিডিয়ায় নারীকে virago, subordinate বা house maker হিসেবে দেখানো হয়, যা সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নারী চরিত্রের উপস্থাপনও প্রাসঙ্গিক, যেখানে নারীকে স্বাধীনচেতা এবং প্রগতিশীল হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর গল্প এবং নাটকে নারীর বঞ্চনা, প্রতিবাদ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা তুলে ধরা হয়েছে, যা অ-বিভক্ত ও বিভক্ত বাংলাদেশের নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নারীকে ছকভাঙারূপে দেখানো হয়েছে, যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি'র কপিলা, যা নাট্যসাহিত্যে প্রান্তিক নারীর চিত্রায়নে অনন্য।

এছাড়া, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর মার্জিনালাইজেশন নিয়ে ভাবনায় দেখা যায় যে, তারা সিম্বলিক পার্টিসিপেশনে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা একটি চলমান থিম, যা সাহিত্যিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের জন্য উর্বর ক্ষেত্র।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর উপস্থাপন এবং প্রান্তিকতার বিষয়টি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব না। এই প্রেক্ষাপট উপনিবেশকালীন যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলো নারী চরিত্রের চিত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নারীর প্রান্তিকতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং উপনিবেশবাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর, নারীর প্রান্তিকতা যুদ্ধের আঘাত, ধর্ষণ এবং সামাজিক পুনর্বাসনের সাথে জড়িত। এই অংশে আমরা এই ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মনে করব, যা বাংলাদেশের নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে।

উপনিবেশকালীন যুগ (ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী):

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নারীর প্রান্তিকতা একটি গভীর সামাজিক সমস্যা ছিল, যা উপনিবেশবাদ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা তীব্রতর হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে, বাংলার শহুরে অভিজাত শ্রেণী নারীর শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নিয়ে সূক্ষ্ম মতভেদ দেখিয়েছে, কিন্তু সাধারণত নারীকে ঘরোয়া ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সুমন্ত ব্যানার্জির গবেষণায় দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীর জনপ্রিয় সংস্কৃতি (যেমন যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান) প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক নারীর এই সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণকে অশ্লীল এবং অশিক্ষিত বলে মনে করতেন, যা নারীকে সামাজিক প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন এন. অগাস্টাস উইলার্ডের মতো ব্রিটিশ লেখকরা নারীর অজ্ঞতা এবং লাইসেন্সিয়াস গানের প্রতি আকর্ষণকে সমালোচনা করেছেন, যা ব্রিটিশ শিক্ষা এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে নারীকে 'উদ্ধার' করার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

এই যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উত্থান ঘটে, যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকাররা নারী চরিত্রকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নারীকে নিম্নবর্গীয় শোষণের শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা উপনিবেশবাদী অত্যাচারের প্রতিফলন। নারীকে মাতৃত্ব এবং পরিবারের মাধ্যমে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সীমিত। এই উপস্থাপনা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে নারীকে ঘরোয়া এবং নৈতিক ভূমিকায় রাখা হয়েছে। উপনিবেশকালে নারীর শিক্ষা এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠলেও, এটি প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যা নিম্নবর্গীয় নারীকে আরও প্রান্তিক করে তুলেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে নারীর উপস্থাপন পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে নারীকে স্বাধীনচেতা এবং প্রগতিশীল হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেমন 'চিরকুমার সভা' বা 'রক্তকরবী'। কিন্তু এখানেও নারীর প্রান্তিকতা সামাজিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত, যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াইকে তুলে ধরে। ১৯৪৭-এর বিভাজনের পর, পূর্ব পাকিস্তানে নাট্য আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে নারীকে ভাষা আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করা হয়।

বিভাজন-উত্তর এবং পূর্ব পাকিস্তান যুগ (১৯৪৭-১৯৭১):

১৯৪৭-এর বিভাজনের পর, পূর্ব বাংলায় (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান) নাট্যসাহিত্য একটি নতুন মাত্রা নেয়। এই যুগে নারীর প্রান্তিকতা ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দমনের সাথে জড়িত। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল, কিন্তু নাটকে তাদেরকে প্রধানত পুরুষের সহায়ক ভূমিকায় দেখানো হয়েছে। মুনীর চৌধুরী এবং সৈয়দ শামসুল হকের মতো নাট্যকাররা নারীকে সামাজিক সংঘর্ষের শিকার হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে মিলিত, যেমন 'নারীগণ' নাটকে নবাব মহলে বন্দি নারীদের জীবন। এখানে নারীকে লুণ্ঠিত এবং অধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা পাকিস্তানি শাসনের প্রতিফলন।

এই যুগে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত ছিল। ফারজানা রাহমানের গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক বর্জন ঐতিহাসিকভাবে ব্যক্তিগত এবং কাঠামোগত কারণে ঘটেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে

ঘরোয়া ভূমিকায় রাখতে চায়, যা নাটকে প্রতিফলিত। ১৯৬০-এর দশকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে নাটক সামাজিক সমস্যা তুলে ধরে। সেলিম আল দীনের প্রভাবিত নাটক দেশজ সংস্কৃতি থেকে নেয়া, যেখানে নারী প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। নারীকে যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অসমতার শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগ (১৯৭১-আধুনিক কাল):

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। যুদ্ধে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল— তারা যোদ্ধা, নার্স এবং শিকার হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধ-উত্তর সমাজে নারীকে প্রান্তিকীকরণ করা হয়েছে, বিশেষ করে ধর্ষিত নারীদের সামাজিক অবহেলা। বাংলাদেশে নারীবাদের বিবর্তন উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা গঠিত, যা নাটকে প্রতিফলিত। সেলিম আল দীনের নাটকে নারীকে যুদ্ধের পরবর্তী সংকটে চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উঠে আসে।

১৯৭২ সালে সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন প্রবর্তন করা হয়, যা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে, কিন্তু এটি প্রতীকী। সৈয়দা লাসনা কবিরের গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীর সার্বভৌম প্রতিনিধিত্ব সীমিত, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবে। এই প্রেক্ষাপট নাটকে নারীর প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে, যেমন আব্দুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে যৌন-রাজনীতি এবং নিম্নবর্গীয় নারীর চিত্রায়ন। ১৯৮০-এর দশকে টেলিভিশন নাটকের উত্থান ঘটে, যেখানে নারীকে স্টিরিওটাইপিকাল ভাবে দেখানো হয়— গৃহবধূ, অধীনস্ত বা যৌনতার প্রতীক। এই উপস্থাপনা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিফলন।

আধুনিক যুগে, বাংলাদেশের নাটকে নারীর উপস্থাপন আরও বৈচিত্র্যময়। প্রবাসীত্ব, যৌনহয়রানি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার থিম উঠে আসে। কিন্তু প্রান্তিকতা এখনও উপস্থিত, যা রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসমতার সাথে জড়িত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকতা দেখা যায় যে, তারা প্রতীকী অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ, যা নাটকে প্রতিফলিত। উদাহরণস্বরূপ, সমসাময়িক নাটকে নারীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপব্যবহারের শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যা ঐতিহাসিক পিতৃতন্ত্রের ধারাবাহিকতা। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দেখায় যে, বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা সমাজের আয়না। উপনিবেশকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, নারীকে অধীনতা, প্রতিরোধ এবং মুক্তির মধ্যে চিত্রিত করা হয়েছে, যা লিঙ্গবৈষম্যের সমালোচনা করে। ভবিষ্যতে নাট্যসাহিত্যে নারীর আরও সমতামূলক উপস্থাপন দরকার, যা সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে।

নির্বাচিত কিছু নাটকের বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারী ও প্রান্তিকতার উপস্থাপনকে গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রধান নাটকগুলির বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এই অংশে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের উদাহরণস্বরূপ বিশ্লেষণ করব, যেমন সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং 'নুরুলদীনের সারাজীবন', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' এবং 'চাকা', এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা'। এই নাটকগুলিতে নারী চরিত্রগুলি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, যুদ্ধের আঘাত, অর্থনৈতিক অসমতা এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের মধ্যে প্রান্তিক অবস্থানে চিত্রিত হয়েছে। এই উপস্থাপনা কেবল নারীর দুর্দশা দেখায় না, বরং তাদের প্রতিরোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্পও তুলে ধরে। বিশ্লেষণে আমরা দেখব যে এই নাটকগুলি উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষাপটে নারীর প্রান্তিকতাকে কীভাবে প্রতিফলিত করে।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়':

সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি কাব্যনাট্য, যা বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি মাইলফলক। এই নাটকে নারী চরিত্রগুলি যুদ্ধের শিকার হিসেবে প্রান্তিকীকৃত, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিরোধের শক্তি লক্ষণীয়। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'মা' বা নারীগুলি যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, ধর্ষণ এবং সামাজিক অবহেলার মুখোমুখি হয়। উদাহরণস্বরূপ, নাটকে একটি নারী চরিত্র যুদ্ধের পর তার সন্তানকে হারিয়ে প্রান্তিক জীবন যাপন করে, যা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা তীব্রতর হয়।

"মেয়ে। সন্তান না দেখে যদি, কে আছে দেখার?

.....

--মনে আছে? —গতকাইল সন্ধ্যার সময়?
তখন পুকুর থিকা ফিরা আসছে হাঁস,
নিজে হাতে ঘরে নিছি, খিল দিছি, শিয়াল খাটাস
য্যান নাগাল না পায়। নমাজের শেষে আম্মাজান

.....

পাকঘরের দুয়ারে। দেখি, আপনে, পটের লাহান।
'কি লাগবে? কি দিমু বা'জান?-
তার না দিয়া উত্তর
'তর মা-য়ে কই? বইলা ঘরের ভিতর
গিয়া কইলেন, পাকঘর থিকা শোনা যায়,
'মেয়েটারে মেলেটারি চায়।
কইলেন,' এতে কোনো দোষ নাই,
রাজী করছি সে হইবো আমার জামাই।'
কইলেন, কলমা পড়ায়া দিমু রীতিমতো বিয়া
না হয় দেশের ছেলে না-ই হইল, দেশ ধুইয়া
পানি খামু ? দেইখা নিও এই যুদ্ধ শেষ হইলে পর
সোনায় মুড়ায়া দিবে তোমার এ ঘর।"[২]

নাট্যকার এখানে নারীকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তারা যুদ্ধের শিকার হলেও জাতির মুক্তির জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। এই উপস্থাপনা উপনিবেশোত্তর প্রতিরোধের একটি উদাহরণ, যেখানে নারীকে অধীনতার প্রতীক থেকে প্রতিরোধের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। নাটকের ভাষা কাব্যময়, যা নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে গভীর করে। প্রান্তিকতা এখানে শারীরিক এবং মানসিক উভয় মাত্রায় প্রকাশিত—যুদ্ধের পর নারীকে সমাজে পুনর্বাসন না করা, যা লিঙ্গবৈষম্যের সমালোচনা। এই নাটক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে, যেখানে নারী প্রান্তিকতা জাতির ইতিহাসের অংশ।

সৈয়দ শামসুল হকের 'নুরুলদীনের সারাজীবন':

নাট্যকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'নুরুলদীনের সারাজীবন' (১৯৯৪), যা একজন সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী দিয়ে সমাজের প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে। এখানে নারী চরিত্রগুলি পারিবারিক এবং সামাজিক প্রান্তে অবস্থিত। নুরুলদীনের স্ত্রী বা নারীগুলি অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, পুরুষের অধীনতা এবং সামাজিক চাপের শিকার। নাটকে নারীকে মাতৃত্ব এবং পরিবারের রক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, নুরুলদীনের জীবনের সংকটে নারী চরিত্রগুলি প্রান্তিকীকৃত হয়, যেখানে তারা সমাজের নিয়মের

দ্বারা বন্দি। এই নাটক উপনিবেশোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে নারীকে গ্রামীণ জীবনের মার্জিনাল ফিগার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, লিসবেথ এর উক্তিতে,

> "তাহলে মহিলা নয়, রমণী? সংগিনী?
> নর্ম সহচরী?
> প্রকাশ্যে বা গোপনে সে প্রনয়িণী ছাড়া কিছু নয়?
> ভালো। এ বিষয়ে পরে কথা হবে।
> সময় সংকীর্ণ আর কোম্পানীর এমনই দুর্ভাগ্য
> যে আপনাদেরই হাতে আপাতত এ মুহূর্তে,
> রংগপুরে কোম্পানীর অস্তিত্ব মর্যাদা সব নির্ভর করছে।"[৩]

প্রান্তিকতা এখানে অর্থনৈতিক এবং লিঙ্গভিত্তিক— নারীকে পুরুষের অধীনস্ত হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিরোধের সম্ভাবনা উঠে আসে। নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি নারীবাদী, যা সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা':

সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' (১৯৯৫) নাটকটি গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের অংশ, যা দেশজ সংস্কৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। এই নাটকে নারী চরিত্রগুলি গ্রামীণ বাংলার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যেখানে তারা অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বঞ্চনার শিকার। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বেদেনী' বা নারীগুলি যাত্রা দলের সদস্য, যা সমাজের মার্জিনে অবস্থিত।নাট্যকার এখানে নারীকে উপনিবেশোত্তর প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তারা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মাধ্যমে আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রান্তিকতায় এখানে সাংস্কৃতিক— নারীকে গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু শহুরে আধুনিকতার দ্বারা অবহেলিত। নাটকের ভাষা এবং ফর্ম দেশজ, যা নারীর মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাকে তুলে ধরে। এই উপস্থাপনা বাংলাদেশের থিয়েটারকে ডেকোলোনাইজ করে, যেখানে নারী প্রান্তিকতা থেকে প্রতিরোধের উৎস।

সেলিম আল দীনের 'চাকা':

সেলিম আল দীনের 'চাকা' (হুইল) নাটকটি উপনিবেশোত্তর চ্যালেঞ্জের একটি উদাহরণ, যা পশ্চিমা প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেখায়। এখানে নারী চরিত্রগুলি প্রান্তিক জীবনের অংশ, যেখানে তারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংঘর্ষের মুখোমুখি। নাটকের ফর্ম এবং কনটেন্ট দেশজ, যা নারীকে মার্জিনাল ফিগার হিসেবে চিত্রিত করে। প্রান্তিকতা এখানে হেজেমনির বিরুদ্ধে— নারীকে সাবালটার্ন হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু তাদের প্রতিরোধ লক্ষণীয়।

আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা':

আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা' (১৯৮৯) নাটকে যৌন-রাজনীতি এবং নিম্নবর্গীয় নারীর চিত্রায়ন দেখানো হয়েছে। নারী চরিত্রগুলি প্রান্তিক, যেখানে তারা পিতৃতান্ত্রিক অত্যাচারের শিকার। নাটকে নারীকে অধীনস্ত হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু সংলাপের মধ্যে তাদের দ্বন্দ্ব উঠে আসে। এই নাটকের বিশ্লেষণ দেখায় যে বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা একটি কেন্দ্রীয় থিম, যা সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকে প্রতিফলিত করে এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানায়।

প্রান্তিকতার থিমস:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর প্রান্তিকতা বিভিন্ন থিমের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা সমাজের লিঙ্গভিত্তিক অসমতা, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে। প্রান্তিকতা (marginality) এখানে নারীকে সমাজের কেন্দ্র থেকে দূরে ঠেলে দেয়, যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, যুদ্ধের আঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অভিবাসন এবং 'অদরিং' (othering) এর মতো থিমগুলির মধ্যে উঠে আসে। এই থিমগুলি নারীকে শুধু শিকার হিসেবে নয়, প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবেও চিত্রিত করে। বাংলাদেশী নাট্যকাররা, যেমন সেলিম আল দীন, সৈয়দ শামসুল হক এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুন, এই থিমগুলিকে তাদের নাটকে ব্যবহার করে সমাজের সমালোচনা করেছেন,নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গবৈষম্যকে অনুসন্ধান করে।

পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং 'অদরিং':

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রান্তিকতার মূল থিম। বাংলাদেশী নাটকে নারীকে 'অদর' (other) হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা সিমোন দ্য বোভোয়ারের ধারণার সাথে মিলে যায়। এখানে নারীকে পুরুষের অধীনস্ত বা 'পর' হিসেবে দেখানো হয়, যা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে নারী পিতৃতান্ত্রিক চাপের শিকার, যেখানে তারা পরিবারিক নিয়মের দ্বারা বন্দি। এই থিম ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতিতে নারীর জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রান্তিকীকরণ থেকে উদ্ভূত, যেখানে নারীকে অশ্লীল বা নিম্নশ্রেণীর সাথে যুক্ত করা হতো। আধুনিক নাটকে, যেমন আল-মামুনের 'কোকিলারা', নারীকে যৌন-রাজনীতির শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের প্রান্তে ঠেলে দেয়। এই থিম নারীকে 'যৌন বস্তু' বা 'অপ্রয়োজনীয় সত্তা' হিসেবে চিত্রিত করে, যা পিতা বা স্বামীর মালিকানায় সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশী নাটকে এই 'অদরিং' নারীর পরিচয় গঠনকে প্রভাবিত করে, যা তাদেরকে সমাজের কেন্দ্র থেকে দূর করে রাখে।

যুদ্ধ এবং সহিংসতার প্রভাব:

যুদ্ধ এবং সহিংসতা নারীর প্রান্তিকতার আরেকটি কেন্দ্রীয় থিম। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নারীকে ধর্ষণ এবং অবহেলার শিকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা যুদ্ধ-উত্তর সমাজে তাদের প্রান্তিক করে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী যুদ্ধের পরবর্তী সংকটে প্রান্তিক, যেখানে তারা সামাজিক পুনর্বাসনের অভাবে ভুগে। এই থিম নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত, যা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বাংলাদেশী নাটকে যুদ্ধ নারীকে 'শিকার' থেকে 'প্রতিরোধী' হিসেবে রূপান্তরিত করে, কিন্তু সমাজের অবহেলা তাদের প্রান্তিক রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকে নারী যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় প্রান্তিক, যা জাতির মুক্তির জন্য তাদের ত্যাগকে তুলে ধরে। এই থিম সমাজের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা নারীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয়।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য:

অর্থনৈতিক বৈষম্য নারীর প্রান্তিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম। বাংলাদেশী নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীকে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা তীব্রতর। সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' নাটকে গ্রামীণ নারীকে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যেখানে তারা দারিদ্র্য এবং শোষণের মুখোমুখি। এই থিম বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকতাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে তারা প্রতীকী অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ। সামাজিক বৈষম্য নারীকে পরিবারিক এবং সমাজীয় চাপের শিকার করে, যা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীর জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে প্রান্তিক করা হয়েছে,

যা আধুনিক নাটকে অব্যাহত। এই থিম নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবকে তুলে ধরে, যা তাদেরকে সমাজের মার্জিনে রাখে।

অভিবাসন এবং পরিচয় গঠন:

অভিবাসন নারীর প্রান্তিকতার আরেকটি থিম, যা 'অদরিং' এবং পরিচয় গঠনের সাথে জড়িত। বাংলাদেশী নাটকে প্রবাসী নারীকে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যেমন মনিকা আলীর 'ব্রিক লেন' এর প্রভাবিত নাটকে। এখানে নারীকে ডায়াস্পোরায় প্রান্তিক করা হয়, যা তাদের পরিচয়কে পরিবর্তিত করে। এই থিম ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশের নারী লেখকদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে, যা প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। ডায়াস্পোরিক নারী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিরোধ দেখায়, যা নাটকে প্রতিফলিত। এই থিম নারীর হাইব্রিড পরিচয়কে অনুসন্ধান করে, যা প্রান্তিকতা থেকে মুক্তির পথ দেখায়।

প্রতিরোধ এবং এজেন্সি:

প্রান্তিকতার মধ্যে প্রতিরোধের থিম উঠে আসে, যা নারীকে শিকার থেকে প্রতিরোধী হিসেবে রূপান্তরিত করে। বাংলাদেশী নাটকে নারী সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজীয় আন্দোলনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই থিম নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত, যা সহিংসতা এবং মার্জিনালাইজেশনের বিরুদ্ধে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী দেশজ সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিরোধ দেখায়, যা তাদের এজেন্সিকে তুলে ধরে। আধুনিক নাটকে হিজড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই থিম নারীকে 'ভিকটিম' থেকে 'ডিফায়েন্ট' হিসেবে চিত্রিত করে, যা পোস্টডিজিটাল বাংলাদেশে সম্মানের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।

প্রান্তিকতার এই থিমগুলি বাংলাদেশের নাটকে নারীর জটিল অবস্থানকে তুলে ধরে। এগুলি সমাজের অসমতাকে সমালোচনা করে এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানায়। ভবিষ্যতে নাট্যসাহিত্যে এই থিমগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার, যা লিঙ্গ সমতাকে প্রচার করবে।

উপসংহার:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারী ও প্রান্তিকতার উপস্থাপন একটি জটিল এবং গভীর বিষয়, যা সমাজের লিঙ্গভিত্তিক অসমতা, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে। উপনিবেশকাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত, নাট্যকাররা নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে চিত্রিত করেছেন, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্যের প্রতীক। সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন এবং অন্যান্য নাট্যকারদের কাজে নারী শুধু শিকার নয়, বরং প্রতিরোধের প্রতিনিধি। এই উপস্থাপনা সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে, যা নারীমুক্তির আন্দোলনকে উস্কে দেয়। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রান্তিকতাকে সাহিত্যিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করা, যেখানে বাংলাদেশী নাটক লিঙ্গবৈষম্যেরও সমালোচনা করে।

সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারী চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নারী জাতীয়তাবাদী প্রতীক, কিন্তু প্রান্তিকতা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে নারীকে ধর্ষণ এবং অবহেলার শিকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী গ্রামীণ প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যা দেশজ সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিরোধ দেখায়। এই পর্যালোচনা দেখিয়েছে যে, নাটক নারীর মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক গভীরতাকে তুলে ধরে, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, উপনিবেশকালে নারীকে অশিক্ষিত এবং অশ্লীল হিসেবে প্রান্তিক করা হয়েছে, যা ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে। বিভাজন-উত্তর যুগে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ নারীর প্রান্তিকতাকে যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক দমনের সাথে জড়িয়েছে। আধুনিক যুগে, টেলিভিশন নাটকে নারীকে স্টিরিওটাইপিকাল ভাবে দেখানো হয়, কিন্তু প্রতিরোধের থিম উঠে আসে। এই প্রেক্ষাপট দেখিয়েছে যে, নাটক সমাজের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যা নারীর অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

প্রধান নাটকের বিশ্লেষণে, 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকে নারী যুদ্ধের শিকার, কিন্তু জাতির মুক্তির প্রতীক। 'কিত্তনখোলা'য় নারী গ্রামীণ শোষণের মুখোমুখি, যা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ দেখায়। 'কোকিলারা'য় যৌন-রাজনীতি নারীকে প্রান্তিক করে, কিন্তু তাদের দ্বন্দ্ব উঠে আসে। এই বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে, নাট্যকাররা নারীকে অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখান।

প্রান্তিকতার থিমসে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অভিবাসন নারীর প্রান্তিকতাকে গঠন করে। 'অদরিং' নারীকে 'পর' হিসেবে চিত্রিত করে, যা পরিচয় গঠনকে প্রভাবিত করে। প্রতিরোধের থিম নারীকে এজেন্সি দেয়, যা নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। এই থিমগুলি দেখিয়েছে যে, প্রান্তিকতা শুধু অধীনতা নয়, বরং মুক্তির উৎস।

বাংলাদেশের কিছু নাটক নারীর প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এটি নারীবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে, যা উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই উপস্থাপনা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, যা ভবিষ্যতের লেখকদের অনুপ্রাণিত করে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এটি লিঙ্গ সমতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা রাজনীতি এবং শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক প্রান্তিকতা দেখিয়েছে যে, তারা প্রতীকী উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ, যা নাটকে প্রতিফলিত। এই আলোচনা সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যা নারীকে কেন্দ্রে আনবে।

ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য এই বিষয়ে কয়েকটি আবেদন করা যায়। প্রথমত, আধুনিক টেলিভিশন এবং ডিজিটাল নাটকে নারীর উপস্থাপন নিয়ে আরও বিস্তারিত অধ্যয়ন দরকার, যা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করবে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক গবেষণা— বাংলাদেশী নাটক এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাটকের মধ্যে নারীর প্রান্তিকতার তুলনা। তৃতীয়ত, নারী নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান, যা পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প দেবে। চতুর্থত, কুয়ার এবং ট্রান্সজেন্ডার চরিত্রের প্রান্তিকতা নিয়ে গবেষণা, যা লিঙ্গবৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এই গবেষণাগুলি নাট্যসাহিত্যকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবে।

শেষকথায়, বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা একটি শক্তিশালী থিম, যা সমাজের অসমতাকে উন্মোচন করে। এটি নারীকে অধীনতা থেকে মুক্তির আহ্বান জানায়, যা একটি সমতামূলক সমাজ গঠনে সাহায্য করে। নাট্যকাররা এই উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজকে চ্যালেঞ্জ করে, যা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। নারীর প্রান্তিকতা শুধু সাহিত্যিক নয়, বরং সামাজিক বিপ্লবের একটি অংশ। এই আলোচনা আশা করে যে, ভবিষ্যতে নাটকে নারীকে আরও কেন্দ্রীয় এবং শক্তিশালী হিসেবে দেখা যাবে, যা লিঙ্গ সমতার পথ প্রশস্ত করবে।

তথ্যসূত্র:

১. আল, আবদুল্লাহ। মামুন। নির্বাচিত নাটক, সম্পাদনা রামেন্দু মজুমদার, নালন্দা, বাংলাবাজার, কা-১১০০, ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ. ৩০০-৩০১।

২. হক, সৈয়দ শামসুল। কাব্যনাট্য সংগ্রহ, বিদ্যা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৪২-৪৩।

৩. হক, সৈয়দ শামসুল। কাব্যনাট্য সংগ্রহ। বিদ্যা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৯০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইকবাল, শহীদ। বাংলাদেশের নাটকের রূপরেখা। খালপার লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০১৮।

২. আউয়াল, সাজেদুল। বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ। রকমারি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

৩. কায়সার, শান্তনু। বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস। থিয়েটারওয়ালা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭।

৪. সেন, সুকুমার। বাংলায় নারীদের ভাষা। কালী ও কলম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০।

৫. চৌধুরী, কবীর। বাংলা নাটকের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১১।

৬. মিশু, এম। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক: পাঠ-পর্যালোচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০২৪।

৭. খোন্দকার, শাহিদা ইসলাম। আনমনা প্রিয়দর্শিনী। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ২০১১।

৮. দে, সুজিত। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃত্ব। জেটিআইআর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৫।

৯. চৌধুরী, মুনীর। বাংলা সহপাঠ। ই-বুকবৌ, ঢাকা, ২০১১।

১০. দাস, সুমন্ত। বাংল মাহিত্যে নাটকের ধারা। আর্কাইভ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

১১. রশীদ, মামুনুর। বাঙালির জাতীয় নাট্যাঙ্গিক: সেলিম আল দীন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১০।

১২. শাহনাজ, আফরিন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী চরিত্র। ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা, ঢাকা, ২০২৩।